রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব - ৭

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কালের অধিকাংশ মহাপুরুষের মতোই, বিরোধী ছিলেন নারীমুক্তির, যে-নারীরা পুরুষাধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্তির কথা বলে, তারা বিকারগ্রস্থ ব’লে বিশ্বাস করেন তিনি। প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নারী কল্যাণী হয়ে থাকবে গৃহে, প্রেম হবে তাদের জীবনের মূলধন; শুধু বিকৃত নারীরাই প্রতিষ্ঠা পেতে চায় বাইরে। ... ...

১৯৩৬-এর অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলনে পড়েন ‘নারী’ (কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৭-৩৮৩) প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তিনি নারীদের আমন্ত্রণে, যে-নারীরা তাঁকে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুক্ত বা মুক্তিপিপাসু, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘অপ্রকৃতিস্থ’, বা ভুলপ্যাককরা। প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকে : এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যা কাজ সন্তান ধারণ ও পালন, যে বইছে ‘আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা’ নিজের স্বভাবের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে, মেনে নেন যে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে বাইরে।

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর পক্ষে কবি-বৈজ্ঞানিক-প্রধানমন্ত্রী হওয়া অস্বাভাবিক, কেননা নারী সহজাতভাবেই পায়নি মানুষের সে-গুন, যা দরকার ওই সব সামাজিক-মানবিক সাফল্যের জন্যে। ‘পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য’; আর ‘মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি’ (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৭৯, ৩৮৫*)। প্রেম-মাধুর্য নারীকে গৃহে আটকে রাখে, তা মধুর ও আলোকিত করে ঘরকে; আর পুরুষের বীর্য ও প্রতিভা উপভোগ ও আলোকিত করে বিশ্ব ও সভ্যতাকে। নারীর ব্যর্থতার মূলে তার জরায়ু; রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন-কি, মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট স্বার্থক হয় নি (*‘নারী’, কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৯*)। পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এমন বিশ্বাস পোষণ ও প্রচার করেছেন ধর্মগ্রন্থে, দর্শনশাস্ত্রে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ও তাঁদের সব কিছুতে; নারীর প্রতিভার সৃষ্টিকে তাঁরা শুধু অবহেলা করেন নি, নারীর প্রতিভা থাকতে পারে ব’লেই বিশ্বাস করেন নি তাঁরা। নারীর প্রতিভাহীনতার কারণ তার জরায়ু, তার অপরাধ সে পালন করে মানুষকে গর্ভে ধারণের মতো অমানবিক কাজ। নারী কীভাবে কাটাবে তার এ-প্রতিবন্ধিতা? যদি জরায়ুই তার শত্রু হয়, তাহলে জরায়ুকেই বাতিল ক’রে দিতে হবে তার। নারী যদি সৃষ্টিশীল হ’তে হয়, তাহলে সন্তানধারণ ও লালনের ব্যক্তিগত কাজ অস্বীকার ক’রে মন দিতে হবে নৈর্ব্যক্তিক কাজে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নারীকে নৈর্ব্যক্তিক কাজের

এলাকায় ঢোকার অনুমতি দিতে রাজি নন।

নারী কী কাজের উপযুক্ত, ঘরের বাইরে গেলে নারীকে মানায় কোন কাজে? নারীর মানানসই কাজের নমুনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন *জাপানযাত্রী*তে (১৯১৯)। বর্মীনারীদের কর্মের হিল্লোল দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এ-প্রশংসাপত্র :

লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্যদেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, এটা বুঝি মেয়েদের উপর জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু, ফলে তো তার উলটোই দেখতে পাচ্ছি-এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা যেনো আরও বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এখন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায় (*জাপানযাত্রী, রর : ১৯, ৩১০*)।

কী কাজ করতে দেখেছেন তিনি নারীদের? অধ্যাপকের, চিকিৎসকের, প্রকৌশলীর, বিজ্ঞানীর, পৌরপতির, সেনাপতির, মন্ত্রীর? এমন কোনো কাজে তিনি দেখেন নি তাদের; দেখেছেন হয়তো মেয়েরা বাজারে যাচ্ছে, চাষ করছে, পানি আনছে, মাঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে, বা কারকাখানায় করছে শ্রমিকের কাজ। তিনি মনে করেন এ-ধরনের কাজে বিকশিত হয় মেয়েরা। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কাজই মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, কিন্তু তিনি কি চাইবেন জোড়াসাঁকোর মেয়েরাও ওই ধরনের কাজ ক'রে অর্জন করুক 'যথার্থ শ্রী'? তিনি তা চাইবেন না; তাই রবীন্দ্রনাথ বর্মীনারীদের যে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন, তার মূল্য বেশি নয়। পৃথিবী জুড়েই মেয়েরা চিরকাল ধ'রে এ-ধরনের নিম্নকাজ ক'রে আসছে, তা সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে নয়; সামাজিক ব্যবস্থাই তাদের বাধ্য করছে এসব কাজে। সাঁওতাল মেয়েদের কাজেরও তিনি প্রশংসা করেছেন, তাদের কাজ থেকে অবশ্য তাঁর চোখে বেশি পড়েছে ওই নারীদের দৈহিক নিটোলতা। কাজ তাদের দেহকে নিটোল করে নি, কাজ নারীদেহকে নিটোল করলে পৃথিবী জুড়েই দরিদ্র নারীদের দেহ নিটোল হতো, রূপসীশ্রেষ্ঠরা দেখা দিতো সামাজিক শূদ্রদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাইরের শারীরিক কাজ মেয়েরা ভালোই করতে পারে, এবং এটা যদি তারা করে, বেশ হয়, বা মেয়েদের খামোখা বাইরে ঠিক নয়, তাদের বাইরে বেরোনো উচিৎ শুধু কাজ করতে। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন নারীদের ভূমিদাসী বা শ্রমিকের কাজ করতে দেখে।

তিনি মনে করেন মেয়েরা ভালো দাসীবৃত্তিতেই; জাপানী দাসীদের দেখে তাঁর মনে হয়েছে :

এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব-চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী।.....যেন মানুষের সঙ্গে, পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে, মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা।.....জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে

আরম্ভ করেছে-সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, এটা দেখলেই বোঝা যায়, এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে; এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজেই এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই কর্মতৎপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্যহানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে (*জাপানযাত্রী, রর : ১৯, ৩৩৫*)।

রবীন্দ্রনাথের জাপানি দাসী বন্দনার নিচে লুকিয়ে আছে নারীদের কর্মযোগ্যতা সম্বন্ধে এক ভীতিকর দর্শন : দাসীবৃত্তি নারীদের জন্যে স্বাভাবিক। নারীদের রূপান্তরিত করতে হবে দাসী নামের পদার্থে, একাকার ক'রে দিতে হবে মানুষ-মোম-মাংসকে; তারা 'স্বাভাবিক' হচ্ছে 'প্রাকৃতিক'-এর অন্যনাম; তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীদের দাসীবৃত্তি প্রাকৃতিক। নারীদের বিলাস অবৈধ, কাজ না করলে বিকৃত হয় নারীরা, হানি ঘটে তাদের দেহমনসৌন্দর্যের। মনু বিধান দিয়েছিলেন যে নারীদের কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে সব সময়, নইলে নারীরা পরপুরুষের চিন্তায় নষ্ট হয়ে যাবে; বাইবেলে ঈশ্বর ও গুনবতী ভার্যার প্রশংসা ক'রে বলেছে যে সে আলস্যের খাদ্য খায় না। জাপানি দাসীরা আলস্যের অন্ন তো খায়ই না, বরং তারা কাজকে পরিণত করে সৌন্দর্যের হিল্লোলে, বা কর্মনাট্যে, যা অনুমোদন করবেন মনু আর ঈশ্বর, যার বন্দনা করেন রবীন্দ্রনাথ। নারীরা শুধু দাসীতে সফল নয়, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তারা ব্যবসাও করতে পারে :

এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাববিদ্ধ; .....কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক।....যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না সে-সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস।.....যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের (*জাপানযাত্রী, রর : ১৯, ৩২৩*)।

রবীন্দ্রনাথ আবিস্কার করেছেন নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য : নারীরা মানুষের মন বুঝতে পারে; মানুষের সাথে সম্বন্ধ রক্ষা করতে পারে; এবং তারা কর্মকুশল। পিতৃতন্ত্র নারীদের এ-গুনগুলোর প্রশংসা ক'রে আসছে কয়েক সহস্রক ধ'রে, এবং নারীরা যাতে বিরত না হয় এগুলোর চর্চা থেকে তার ওপর রেখেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এগুলো দাসদের গুন; মন বুঝে চলতে হয় তাদের, নইলে তাদের পড়তে হয় বিপজ্জনক পরিস্থিতে; সম্বন্ধও রক্ষা করতে হয় তাদের, এবং কর্মকুশলতায় তারা জয় করে প্রভুর মন। স্বাধীন পুরুষের কাছে এসব কাপুরুসতা; কিন্তু নারী যেহেতু দাস শ্রেনীরই অন্তর্ভুক্ত, যেমন দাবি করেছেন আমূল নারীবাদীরা, তাই তারা চলার চেষ্টা করে অপরের মন বুঝে, মানিয়ে নিতে চায় অপরের সাথে। একে স্বাভাবিক বলার অর্থ হচ্ছে শূদ্রদের শূদ্রত্ব স্বাভাবিক। পিতৃতন্ত্র সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারকে জৈবিক ও শাশ্বত ব'লে গণ্য করেছে, রবীন্দ্রনাথও করেছেন। পুরুষতন্ত্র নারীদের বিকৃত ক'রে নিজের উপযোগী ক'রে নিয়েছে, এসব নারীদের স্বাভাবিক স্বভাব নয়, নারীরা ব্যবসা করতে পারে, এতে তিনি বিশ্বাস করেন, এবং তার প্রমাণও তিনি পেয়েছেন; তবে তিনি ব্যবসা বলতে বোঝেন মুদি দোকান চালানো, যার যোগ্য নারীরা। নারীরা যে শারীরিকভাবে দুর্বল, এটা সকলের জানা; রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীরা মানসিকভাবেও দুর্বল। 'যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না', রবীন্দ্রনাথের মতে, সে-সব করতে পারে নারীরা। তাঁর এ-মত অভিনব নয়, পুরুষ নারীদের সম্পর্কে এ-ধারণা পোষণ ও প্রচার ক'রে আসছে পিতৃতন্ত্রের সূচনাকাল থেকেই। রুশো এমিল-এ এটা আলোচনা

করেছেন বিশদভাবে; রবীন্দ্রনাথের মত রুশো মতেরই প্রতিধ্বনি। নারী যেমন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী তেমনি প্রতিবন্ধী মানসিকভাবে; তারা করতে পারে সে-সব কাজ যাতে 'উদ্ভাবনার দরকার নেই', যাতে 'পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার'। রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রশংসাপত্র দিয়েছেন যে তারা ব্যবসা করতে পারে; তবে 'ব্যবসা' বলতে তিনি আসল ব্যবসা বোঝান নি। ব্যবসার জন্য দরকার সাহস, উদ্ভাবন শক্তি, তাই নারীরা ব্যবসার উপযুক্ত নয়; রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারী বড়োজোর হ'তে পারে মুদি; তিনি তা বিলেতে দেখেছেন, জাপানে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন নারীপুরুষের পৃথক এলাকায় বিশ্বাসী, তেমনি নারী যখন বাইরের কাজে আসে তখনও তিনি নারীপুরুষের পৃথক কাজে বিশ্বাসী। এক শ্রেনীর তুচ্ছ কাজ আছে, যা করবে নির্বোধ দুর্বল নারী; আর অধিকাংশ সভ্যতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ করবে উদ্ভাবনশীল সাহসী পুরুষ। নারী হবে মুদি, সেবিকা, বিমান বালা, পুরুষ নির্বাহীর ব্যক্তিগত সহকারী; আর পুরুষ হবে সভ্যতার নিয়ন্ত্রক।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কালের অধিকাংশ মহাপুরুষের মতোই, বিরোধী ছিলেন নারীমুক্তির, যে-নারীরা পুরুষাধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্তির কথা বলে, তারা বিকারগ্রস্থ ব'লে বিশ্বাস করেন তিনি। প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নারী কল্যাণী হয়ে থাকবে গৃহে, প্রেম হবে তাদের জীবনের মূলধন; শুধু বিকৃত নারীরাই প্রতিষ্ঠা পেতে চায় বাইরে। *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*তে (১৩৩৬) তিনি লিখেছেন :

প্রাকৃতিক অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম ও মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এমন কথা দুই-একজন মেয়ে বলতেও পারে; কারণ যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উলটোপালটা হয় না, তা নয় (*রর : ১৯, ৩৮৩*)।

নারীমুক্তির কথা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, কোনো নারী 'প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বলতে পারে না; উন্মাদিনীরাই শুধু বলতে পারে এমন অস্বাভাবিক কথা। নারীমুক্তি হচ্ছে পাগলামো! তিনি পশ্চিমের নারীমুক্তিবাদীদের লক্ষ্য ক'রেই এসব বলেছেন, তাদের ক্রিয়াকলাপকে নিন্দা করেছেন 'আস্ফালন' বলে। তিনি চান নারী থাকবে 'প্রাণের রাজ্যে' চিরস্থায়ীভাবে; নারী সন্তান ধারণ ও প্রসব করবে, মনের রাজ্যে তার অধিকার নেই। যদি কোনো নারী মনের রাজ্যে ঢুকতে, বুঝতে হবে তার ভেতরে রয়েছে কোনো গোলমাল। যে-নারী কবিতা লেখে, বিজ্ঞান চর্চা করে সে বিকৃত, প্রকৃতি ভুল ক'রে তার ভেতর ঢুকিয়েছে একটা পুরুষকে। যারা বাইরে নারী আর ভেতরে পুরুষ, তারা অবশ্যই বিকৃত। রবীন্দ্রনাথের প্যাকিংতত্ত্ব অনুসারে কৃতী সব নারীই বিকৃত : স্বর্ণকুমারী দেবী, বা বেগম রোকেয়া, মেরি ওলস্টোনক্রাফট, জর্জ এলিয়ট, মাদাম ক্যুরি বিকৃত, তাঁদের ভেতরে প্রকৃতি ভুল ক'রে বোঝাই করেছে পুরুষের স্বাভাব। রবীন্দ্রনাথের এ-মতের সাথে মিল আছে ফ্রয়েডের 'পুংগূঢ়ৈষা'র, যার সার কথা হচ্ছে ব্যর্থ বিকৃত নারীরাই প্রতিষ্ঠা চায় বাইরের জগতে। মেয়েরা মুক্তি চায় কেনো? তার কারণ নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

একদল মেয়ে বলতে শুরু করেছে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।" এর থেকে বোধ হচ্ছে, একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক (*পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৯১*)।

পুরুষ সম্পর্কে অসাধারণ ভাববাদী ধারণা পোষণ রবীন্দ্রনাথের স্বভাব; যে-পুরুষ সফলভাবে নারীকে গৃহে

আটকে রাখতো, সে তাঁর চোখে সাধক; যে-পুরুষ নারীকে আটকে রাখতে পারছে না, সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চোখে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ-বণিক। তিনি আরো বলেছেন, '*পুরুষ একদিন ছিল মিষ্টিক, ছিল অতল রসের ডুবারি। এখন হয়েছে মেয়েদের সংসারী*' (*ওই, ৩৯২*)। পুরুষ বণিক হয়ে পড়েছে, সংসারী হয়ে পড়েছে, তাই নারী ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, এটা বেশ আধ্যাত্মিক ভারত বর্ষীয় ব্যাখ্যা। নারীরা কেনো মুক্তি চায়, রবীন্দ্রনাথের এ-রচনা লেখার সময় তা নারীরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি নারীবাদীদের কোনো লেখা পড়ার আগ্রহ বোধ করেন নি কখনো?

১৯৩৬-এর অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলনে পড়েন 'নারী' (কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৭-৩৮৩) প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তিনি নারীদের আমন্ত্রণে, যে-নারীরা তাঁকে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুক্ত বা মুক্তিপিপাসু, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অপ্রকৃতিস্থ', বা ভুলপ্যাককরা। প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকে : এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যা কাজ সন্তান ধারণ ও পালন, যে বইছে 'আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা' নিজের স্বভাবের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে, মেনে নেন যে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে বাইরে। যে-নারীরা আর কল্যাণী হয়ে থাকতে চান না, তাঁদের আমন্ত্রণে তাঁদের সম্মোলনে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পুর্ণ বিরুদ্ধে বলবেন, এমন অরুচিকর স্বভাব ছিলো না তাঁর। তিনি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন নতুন নারীদের সাথে। এ-প্রবন্ধে নারীবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ওপরে দিয়েছি, এখন দেখতে চাই রবীন্দ্রনাথ কতোটা মেনে নিয়েছেন নারীমুক্তিকে। কৃতজ্ঞবোধ করছি নিখিলবঙ্গ-মহিলাকর্মীদের প্রতি, কেননা তাঁরা নিজেদের সভায় আমন্ত্রন ক'রে উদ্ধার করেছিলেন পিতৃতান্ত্রিক রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রন না জানালে তাঁর তিরোধান ঘটতো নারীমুক্তি বিরোধী পুরুষতন্ত্রের এক বড়ো পুরোহিত রূপে; আমন্ত্রিত হয়ে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, কাটিয়ে ওঠেন নিজের আযৌবন প্রগতিবিরোধিতা, স্বীকার ক'রে নেন নারীমুক্তিকে, অনেকটা বাধ্য হয়ে। নারীরাই সৃষ্টি করেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে, যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। যে-নারীমুক্তি একদিন তাঁর কাছে ছিলো অপ্রকৃতস্থ ভুলপ্যাককরা একদল নারীর আস্ফালন, তা এখন তাঁর কাছে হয়ে উঠে অনিবার্য :

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গন্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষন দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। ..... বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে (*ওই, ৩৭৯-৩৮০*)।

অনেক কাল তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতিই নারীকে বন্দী করেছে ঘরে, এখন প্রকৃতির সে-অমোঘ নিয়ম হয়ে ওঠে 'আচার-বিচার' অর্থাৎ প্রথা। তাঁর বিশ্বাসই বাতিল হয়ে যায় এর ফলে। যে-গৃহ একদা ছিলো তাঁর চোখে নারীর অনিবার্য এলাকা, তা হয়ে ওঠে অতীতের ব্যাপার :

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলছে, এই-যে মুক্ত-সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বশেষ করে বুদ্দির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল (*ওই, ৩৮১*)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন মেয়েদের এলাকা 'স্বতই প্রসারিত হয়ে চলছে', 'মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে'; তবে একটু ভুল বুঝেছেন তিনি, কেননা ঘটনাটি এতো স্বতই ও আপনিই ঘটে নি। এর জন্যে নারীদের লড়াই করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাথেও। যে-রবীন্রনাথ নারীদের বিশেষ বুদ্ধি

ও বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি এখন তার আবশ্যক বোধ করলেন নারীদের জন্যে; তিনি দেখেন তাঁর 'কল্যাণী'রা বদলে গেছে, বদলে দিচ্ছে পুরুষের সভ্যতাকে :

ঘরের মেয়েরা প্রিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসাম্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষন আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। .... একটি মাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়ার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে-প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। .... এখন অন্ধকুসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে (*ওই, ৩৮২-৩৮৩*)।

তাঁর এতোদিন প্রিয় ছিলো ভূবনের মেয়েকে ভবনের মেয়েরূপে দেখা; বিশ্বাস ছিলো প্রকৃতির বিধান তাই। এক সময় মনে করতেন তিনি মেয়েরা বাইরে এলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে; এখন তিনি তাদের প্রতিভাকে, যাতে তাঁর বিশ্বাস ছিলো না, কাজে লাগাতে চাইলেন সভ্যতার ভারসাম্য সৃষ্টিতে। নারী পুরুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে, নিজের নারীত্বকে সভ্যতায় সংক্রমিত ক'রে পুরুষালি সভ্যতাকে কোমল করবে, বিধান করবে সভ্যতার সামঞ্জস্য, এমন কথা তিনি আগে (১৯১৭) বলেছেন ; তবে এখন যে-ভারসাম্যের কথা বলেন তা প্রকৃতিতে ভিন্ন। তবে নারী যে সন্তান জন্ম দেয় আর লালন করে, তা ভোলেন নি তিনি, তাই নারীকে দেন 'সকল লোককে রক্ষার' দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত নারী হয়ে উঠে সব মানুষের মা। তাহলে পূরুষ কী করবে? রবীন্দ্রনাথ নারীপুরুষের নতুন সভ্যতার রূপরেখা ও আঁকেন :

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমানে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়।.....সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ (*ওই, ৩৮৩*)।

রবীন্দ্রনাথ নতুন কল্প আশা করেন, যাতে পুরোপুরি অংশ নেবে নারীরা। তবে তিনি যেনো মনে করেন এ-নতুন কল্প সূচনা করেছে পুরুষ, তারা ডাকছে নারীকে, আর নারীদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের রক্ষনশীলতা ছেড়ে নতুন কল্প সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করা। অভিযুক্ত করেছেন তিনি নারীদেরই, যেনো তারা হৃদয়কে মুক্ত আর, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করে নি ব'লে, জ্ঞানের তপস্যায় নিষ্ঠা প্রয়োগ করে নি ব'লে বিলম্বিত হয়েছে নতুন কল্প। কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত, পুরুষেরাই-যাদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথও, সর্বশক্তিতে প্রতিরোধ ক'রে এসেছে নতুন কল্পকে। তবু সুখকর হচ্ছে যে পঁচাত্তর বছর বয়সে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, এবং আরো সুখকর হচ্ছে যে নারীরাই রূপান্তরিত করেছিলো তাঁকে।

———সমাপ্ত———

****

তথ্যসুত্র : ডঃ হুমায়ুন আজাদ, নারী ; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০। {অনুলিখন : অনন্ত}